ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালির ‘প্রাচ্য’ ও ‘পাশ্চাত্য’ ভ্রমণ : ‘আত্মপ্রতিষ্ঠা’-র প্রকল্প ও প্রয়াস

ভ্রমণবৃত্তান্তের উপস্থাপনশৈলী বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডেবি লিসলে বলেন “...travelogues are usually fashioned over and against a series of others who are denied the power of representing themselves”[1]। আমরা বুঝতে পারি তিনি আসলে, এই কথনপ্রক্রিয়াকে এক অসম ক্ষমতা বিন্যাসের আধার হিসেবে দেখছেন যেখানে কথক তাঁর গন্তব্যস্থলের বাসিন্দাদের এক নির্বাক-নিষ্ক্রিয় ‘অপর’ বানিয়ে রাখতে চান। প্রসঙ্গত লিসলের মতো অনেক ইউরোপীয় তাত্ত্বিকই ভ্রমণবৃত্তান্ত নামক সাহিত্যসংরূপটির বিবিধতা তথা বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একধরনের ক্ষমতা প্রকাশের প্রকল্পায়নের উল্লেখ করছেন। বিশেষত পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতক থেকে শুরু সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশ বিস্তারের পর্বে, ইউরোপ বহির্ভূত বিশ্বের উপর ইউরোপের নানা দেশের আগ্রাসনের সঙ্গে ভ্রমণের এক নিবিড় যোগাযোগের কথা বলেছেন তাঁরা। তাঁদের মনে হয়েছে, উপনিবেশ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক দেশের ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত তথা প্রকাশিত ধ্যানধারণা আদতে কর্তৃত্ব কায়েমেরই এক সুচারু পন্থা হয়ে উঠেছে। উপনিবেশের ‘অচেনা-অদেখা ‘যাপন’-এর উপর ‘অসভ্যতা’, ‘অনগ্রসরতা’-র তক্‌মা বসিয়ে আসলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি নিজেদের স্বনির্মিত ‘সভ্যতা’-র সংজ্ঞাকে মান্যতা দিতে চেয়েছে। তাই যখনই ক্ষমতাসীন পক্ষের তরফ থেকে ক্ষমতাহীনের দেশ-আচার-বিচার-সমাজ-সংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে ‘পরিচয়’ ঘটেছে তখনই ক্ষমতার অসামঞ্জস্যতার অভিঘাতে নতুন দেখা দেশ বা মানুষরা ‘নির্মিত’ হয়েছে নেতিবাচকতার

---

[1]Debbie Lisle, “The Cosmopolitan gaze: rearticulations of modern subjectivity”, *The Global politics of Contemporary Travel writing* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), পৃষ্ঠা- ৬৯.

ব্যঞ্জনা নিয়ে; বিপরীত যুগ্মপদের মানদণ্ডে। 'অচেনা' দেশ ও তাদের 'অজ্ঞাত' মানুষরা সেখানে চিহ্নিত হয় 'শিক্ষিত' 'সুসভ্য' 'সাহসী' ভ্রমণকারীর এক অধস্তন ও অভিব্যক্তিহীন 'অপর' পক্ষ হিসেবে। কিন্তু মুশকিল হল, ক্ষমতার সাপেক্ষে অনুধাবিত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই ভ্রমণ-তত্ত্বের সূত্র ধরে শুধু প্রভুত্বকামীর ক্ষমতার আস্ফালনের ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। সেখানে ক্ষমতাশূন্যের কোনো উচ্চারণ আমরা শুনতে পাইনা। কিন্তু ক্ষমতাশালীবর্গ নির্দিষ্ট এই 'অপর' যখন ভ্রমণের 'বিষয়' থেকে 'বিষয়ী' হয়ে উঠে সক্রিয় ভ্রমণকারীর পদে উন্নীত হয়, তখন তো আত্ম-অপর-এর পরিচয়ের অদলবদল ঘটে যায়। এতক্ষণ যাঁরা অপর বলে পর্যুদস্ত হচ্ছিল তাঁরা যখন 'আত্ম'-এর ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় তখন তারা তাদের 'অপর' পক্ষকে কোন্ মানদণ্ডে বিচার করে? তারা কি ক্ষমতাসীন মহলের অবদমন বা উন্নাসিকতাকেই আত্মস্থ করে নেয়? নাকি তাদের বৃত্তান্তগুলি ঔপনিবেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে আত্ম-প্রতিরোধ আর স্বতন্ত্রীকরণের স্বকীয় পরিসর তৈরি করে 'ভ্রমণ'-এর কোনো প্রতিকথন তৈরি করতে চায়? ক্ষমতাহীন-এর আত্মপ্রকাশ বা 'অপর' উপস্থাপনের এই বিপরীতমুখী ছকটির পাঠগ্রহণই আমার গবেষণার মূল আবর্তন। এক্ষেত্রে আমার নির্বাচিত সময়কাল ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলা। পরাধীন ভারতে, ইংরেজি শিক্ষিত 'নব্য' বাঙালিদের বিদেশ যাত্রার (ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশ) বৃত্তান্তগুলিকে আমি একটি উপনিবেশিত জাতির 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'-র প্রকল্প হিসেবে পড়তে চাইব।

একদিকে দেখতে চাইব, বাঙালি যখন পরাধীন জাতির প্রতিনিধি হয়ে তার ঔপনিবেশিক 'প্রভু' ইংল্যান্ড তথা ইউরোপকে দেখতে যায় তখন পদানতের হীনম্মন্যতা, ঔপনিবেশিক-উপনিবেশিতের অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক তার দৃষ্টিপথকে কীভাবে অভিভূত করে। আবার ঔপনিবেশিকতার দীর্ঘ কালপর্বে, শাসক-শাসিতের সম্বন্ধও তো চিরকাল এক খাতে বাহিত হয়না। উপনিবেশিতের স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা যখন প্রবল হতে শুরু করে, তখন শাসককে

দেখার ধরন বা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে নিজেকে উপস্থাপনের প্রণালীতে কীভাবে বদল আসে।

অন্যদিকে দেখব, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বেড়ানোর সময়, যাদের সঙ্গে বিসম ক্ষমতাসম্বন্ধের আড়ষ্টতা নেই, বরং অনেক সময়েই দেশগুলিকে 'সুপ্রাচীন' ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার ঋণবাহী ভেবে একধরনের 'আত্মশ্লাঘা' আছে, সেখানে ভ্রমণকারীদের 'বহির্দর্শন' এবং সেইসুবাদে গড়ে ওঠা 'আত্মদর্শন' কোন্ পথে চালিত হয়।